চর্যাপদের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি: একটি পাঠ-পর্যালোচনা
[The Theological Basis of Charyapada: A Critical Review]

Hasan A.

Abstract

The Charyapada stands as the primordial and quintessential testament to Bengali literature and culture. In 1907, Pandit Haraprasad Shastri's discovery of this manuscript from the Royal Court Library of Nepal unveiled the most ancient form of the Bengali language to the global scholarly community. The primary objective of the current essay, titled 'The Theoretical Basis of the Charyapada: A Textual Review,' is to analyze the profound mysteries and the underlying conceptual framework of Buddhist Sahajiya philosophy embedded within these verses. The Charyapada is not merely a collection of devotional hymns; rather, it serves as a poetic record of a distinct spiritual praxis (Sadhana) prevalent in ancient Bengal. These songs represent the ultimate synthesis of the Mahayana, Vajrayana, and Sahajayana traditions within the evolutionary trajectory of Buddhism. This essay explores, in detail, the essence of the 'Sahaja' doctrine, the union of Prajna (Wisdom) and Upaya (Means), and the attainment of Mahasukha (Great Bliss) through the convergence of Sunyata (Voidness) and Karuna (Compassion). The linguistic medium of the Charyapada is 'Sandhya Bhasha' (Twilight Language)—a cryptic, metaphorical register used by the Siddhacharyas to conceal their esoteric spiritual methods from the uninitiated under the guise of allegory. This review is constructed based on a rigorous reading of Dr. Mahbubul Haque's Charyagiti Path, alongside the scholarly insights of luminaries such as Haraprasad Shastri, Suniti Kumar Chatterjee, and Shashibhushan Dasgupta. The essay further demonstrates how the composers employed mundane metaphors—such as rowing a boat, brewing liquor, or carding cotton—to demystify the transcendental concept of Nirvana. Ultimately, the Charyapada warrants an interpretation that transcends mere linguistic analysis, necessitating an engagement with its profound theoretical depth.

মুখ্য শব্দ: চর্যাপদ, ধর্মতত্ত্ব, সহজযান পদ্ধতি, বৌদ্ধমত, সন্ধ্যা ভাষা, সিদ্ধাচার্য, মহাসুখ, নিগূঢ়তত্ত্ব

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন হিসেবে গণ্য 'চর্যাপদ'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। একথা সত্য যে, 'চর্যাপদ' নিয়ে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী তাদের নিজস্ব 'সাহিত্যের নিদর্শন' হিসেবে দাবি উত্থাপন করলেও পরিণামে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অরিজিন এ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অব দ্য ব্যাঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থের এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে 'চর্যাপদ'-এর ভাষা বাংলা। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির আদি উৎস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় 'চর্যাপদ'কে অস্বীকার করা অসম্ভব। চর্যাপদ যেমন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রচনা, তেমনি 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ একটি গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের শৈল্পিক প্রকাশও বটে। আচার্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে যখন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়', 'সরহপাদের দোহা' 'কৃষ্ণাপাদের দোহা' এবং 'ডাকার্ণব'– সাকুল্যে চারটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিজের সম্পাদনায় এই চারটি পুঁথি একত্রে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' এই শিরোনামে ১৯১৬ সালে প্রকাশ করেন। 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের পর থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সমালোচক এ প্রসঙ্গে

Department of Bangla, Northern University Bangladesh.
Corresponding Email: farid@nub.ac.bd

যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। শতবর্ষ আগে আবিষ্কারের পর থেকে চর্যাগীতি নিয়ে চলছে নিরন্তর আলোচনা-গবেষণা।'[১] কথাবাহুল্য, 'চর্যাপদ' নিয়ে এই আলোচনা কিংবা সমালোচনা অদ্যাবধি শেষ হয় নি, বরং তা নিয়ে গবেষকবৃন্দের মনে নতুন নতুন আগ্রহের জন্ম দিয়ে চলেছে। বিশেষত সম্প্রতি 'নতুন চর্যাপদ' নামে একটি গ্রন্থ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ-এর সম্পাদনায় ৩৩৫টি পদ নিয়ে প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই সম্ভাবনা আরো ব্যাপকতর হয়েছে। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পদগুলো যেমন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সহজযান মতাদর্শীদের সাধনতত্ত্ব ছিল, তেমনি সৈয়দ মোহাম্মাদ শাহেদ সংকলিত পদগুলো বজ্রযানী মতাদর্শী বৌদ্ধ সাধকদের সাধন-পদ্ধতি নিয়ে রচিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন, আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে সাকুল্যে ৫১টি পদ ছিল, তবে পুঁথিটির কিছু পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ২৪, ২৫, ৪৮ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি ২৩ সংখ্যক পদটিও পরিপূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। 'চর্যাপদের মাধ্যমে ধর্মের তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ রূপক, উপমা, চিত্রকল্প প্রভৃতির সহায়তায় প্রকাশ করেছেন চর্যাকারগণ।'[৩] বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটিতে আমরা আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ'-এর ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমিত। চর্যাপদ বিচারের ক্ষেত্রে এর ভাষা এবং ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাপদে প্রাপ্ত সাধন-পদ্ধতির যেসব গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায় তা নিম্নরূপ :

- **দেহতত্ত্ব :** চর্যার সহজযানী সাধনায় মানবদেহকেই সাধনার কেন্দ্র বা 'তরুবর' মনে করা হয়। লুইপাদের মতে, এই দেহ-বৃক্ষের পাঁচটি ডাল হলো আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়, যা চঞ্চল চিত্তের কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই দেহাভ্যন্তরেই 'বত্রিশ নাড়ী' ও 'দেহ-নগরী'র মাধ্যমে যোগসাধনা সম্পন্ন হয়। তবে এই জটিল সাধনপথে সদ্গুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুর উপদেশ বা 'কুঠার' ছাড়া মনের কামনা-বাসনা নামের বৃক্ষ ছেদন বা কর্তনা করা কিংবা ভবসমুদ্র পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। এ বিষয়গুলো ১, ১১, ২৫, ৪৫ চর্যাপদে স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে; যার ভিত্তি হিসেবে দেহকেই সাধনার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দেহ বৃক্ষ, নৌকা, নগরী, তন্তুর রূপক এসব পদে বারবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে পদকর্তাগণ সাধনার কেন্দ্র হিসেবে দেহকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।
- **গুরু-পরম্পরা :** চর্যাপদে বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে সদ্গুরুর কৃপা ও উপদেশ ব্যতীত সহজজ্ঞান লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব না। সহজযান ও বজ্রযানের পরম্পরায় গুরু কেবল শিক্ষক নন– এখানে তিনি জ্ঞানের জীবন্ত প্রবাহের বাহক হিসেবে গণ্য হন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এখানে দীক্ষার সম্পর্কের পাশাপাশি অনুভবেরও সম্পর্ক বটে। শাস্ত্রপাঠ বা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা দিয়ে যে সত্যে পৌছানো যায় না, সেখানে অনায়াসেই গুরুর নির্দেশিত সাধনপথ চললে পৌছানো সম্ভব। এই তত্ত্বে গুরু-পরম্পরা তাই কেবল ঐতিহ্য নয়– এটি মুক্তির অপরিহার্য শর্ত বলা ভুল হবে না। ১, ২, ১৪, ৩৮, ৪৫ চর্যায় ব্যক্ত করা হয়েছে সদ্গুরুর উপদেশ ছাড়া সহজজ্ঞান বা সাধনার মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।
- **শূন্য-করুণা অভেদ :** চর্যাপদের ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এখানে শুধুমাত্র সহজযানী সাধনপদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেনি; বরং এখানে কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে মহাযানী তত্ত্বের শূন্যতা ও করুণার মিলন লক্ষণীয়। যখন শূন্যতা ও করুণা মিলন ঘটে তখন সাধক 'মহাসুখ' বা 'সহজানন্দ' লাভ করেন। পাশাপাশি, সিদ্ধাচার্যরা মনে করতেন 'ভব' [সংসার] এবং 'নির্বাণ' (মুক্তি) আলাদা কিছু নয়। নিজের মনই এই জগত সৃষ্টি করে; তাই মনের অজ্ঞানতা দূর হলে সংসারই নির্বাণে রূপান্তরিত হয়। ৮, ৩০, ৩৪, ৪৭ চর্যায় মহাযানের মূলতত্ত্বে শূন্যতা, করুণা ও অভেদই মূলকথা হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।
- **ভব-নির্বাণ অভিন্নতা :** চর্যাপদে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সংসার ও নির্বাণের মধ্যে যে বিভেদ আমরা কল্পনা করি– তা মূলত মিথ্যা। এই তত্ত্ব মাধ্যমিক পর্যায়ের দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ– সংসার শূন্য, নির্বাণও শূন্য। দুটোর স্বভাবে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রে মূলকথা হচ্ছে– অজ্ঞতাই সংসারকে বন্ধনের জায়গা করে তোলে, অন্যদিকে জ্ঞান সেখানে মুক্তির উপায়। তাই পলায়নে মুক্তি নেই– রূপান্তরেই মুক্তি। ১৯, ২২, ২৯, ৩৫ চর্যাপদে সংসার ও নির্বাণের পার্থক্য নির্ধারণ করে সত্য-মিথ্যার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
- **নৈরাত্মাদেবীর সাধনা :** চর্যাপদের মূল সাধনতত্ত্বে সহজযানীদের কথা হলেও এখানে কিছু পদের বজ্রযানী সাধনতত্ত্বের পরিচয় রয়েছে। বজ্রযানী মতে নৈরাত্মাদেবী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতীক; যাকে ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি লোকালয়ের বাইরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতির ওপারে বসবাস করেন। সাধক যখন লৌকিক ঘৃণা-লজ্জা ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করেন, তখনই তিনি নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে অদ্বয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন। নৈরাত্মা দেবীকে পেতে হলে ত্রিবিষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ) বিসর্জন দিয়ে 'মার' বা জাগতিক কামনা-বাসনাকে জয় করা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। এসব কথা ২, ১০, ১৪, ১৮, ২৮, ৫০ চর্যায় বলা হয়েছে।
- **মার-বিজয় ও ত্রিবিষমুক্তি :** সহজযানী সাধনপদ্ধতিতে বৌদ্ধ ধর্মের চিরন্তন তথা মূল শিক্ষাটি হচ্ছে– রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই ত্রিবিষ, যা চিত্তকে জগতের সাথে তাকে আবদ্ধ করে রাখে। চর্যাপদে মার হলো এই বিষেরই প্রতিমূর্তি স্বরূপ আধেয়। এই তিন বিষ থেকে মুক্তিই প্রকৃত মার-বিজয়। সিদ্ধাচার্যরা দেখিয়েছেন– বাইরের শত্রু নয়, বরং মানবদেহের

ভেতরের এই তিন শত্রুই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধন; এদের জয় করাই সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ১১, ১৬ চর্যায় রাগ-দ্বেষ-মোহ থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- **বাক্যাতীত সহজানানন্দ** : চর্যাপদের বিবৃত ধর্মসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ হলো সহজানন্দ লাভ, যা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় এবং এইসময় তা ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। সিদ্ধাচার্যরা এই গূঢ়তত্ত্ব যাতে করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে না যায়, এজন্য তারা ইচ্ছাকৃত রূপক-প্রতীকের আড়াল তৈরি করেছেন। ফলে চর্যার ভাষা সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে; ফলে চর্যার ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা' নামে পরিচিতি পেয়েছে। চর্যাপদের বাইরের অর্থ লৌকিক হলেও ভেতরের অর্থ গভীর তান্ত্রিক সাধনা কেন্দ্রিক। জয়নন্দীর মতে, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো জগত যেমন অলীক, তেমনি পরম সত্যও কেবল অনুভবের বিষয়, বর্ণনার নয়। ৩৭, ৪০, ৪৬ চর্যাপদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– পরম সত্য কিংবা নিগূঢ়তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।

চর্যাপদের সাধনতত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মৌলিক উপলব্ধি হচ্ছে– মুক্তি বাইরে নয়, ভেতরে। দূরে নয়, এই দেহেই, এই মুহূর্তেই। পদকর্তা সিদ্ধাচার্যরা দেহকে সাধনার পরম ক্ষেত্র জ্ঞান করে দেখিয়েছেন যে বৃক্ষ, নৌকা বা নগরীর রূপকে যে দেহের কথা বলা হয়েছে, সেই দেহই হচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি। এই দেহসাধনার পথে সদ্গুরুর কৃপা-উপদেশ অপরিহার্য, কেননা শাস্ত্রজ্ঞান বা বুদ্ধিচর্চা নয়, গুরু-পরম্পরার জীবন্ত ধারায় অবগাহন করার মাধ্যমেই একমাত্র সহজজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। সেই জ্ঞানের স্বরূপ হলো শূন্যতা ও করুণার অভেদ উপলব্ধি– প্রজ্ঞা ও মৈত্রীর এই অদ্বয় মিলনেই বোধির পরিপূর্ণতা। আর এই উপলব্ধির আলোয় ভব ও নির্বাণের ভেদ মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। সংসারকে পরিত্যাগে নয়, বরং তার রূপান্তরের মাধ্যমেই মুক্তির পথ পাওয়া যায়। এই পথে নৈরাত্মাদেবীর সাধনা সাধককে অহংকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আর রাগ-দ্বেষ-মোহ রূপ ত্রিবিধ জয়ের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের মার-বিজয় সম্পন্ন হয়। সবশেষে চর্যার কবিরা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এই পরম সহজানন্দ ভাষার অতীত– 'সন্ধ্যাভাষা'র ইঙ্গিতে যতটুকু বলা যায়, তার বাইরে এসব পদের অর্থ কেবল সাধনায় অনুভব বা উপলব্ধি করতে হয়। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে 'চর্যাপদ'-এর ধর্মতাত্ত্বিক এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আলোচনায় চর্যাপদগুলোতে বৌদ্ধ ধর্মের সহজিয়া মতাবলম্বীদের সাধন-পদ্ধতির নিগূঢ় রহস্য রূপক-প্রতীকের আড়ালে কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে– তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হয়েছে।

চর্যাপদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মতাত্ত্বিক বিবর্তন

চর্যাপদের পদগুলো রচিত হয়েছিল মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময়টি ছিল বাংলায় পাল বংশের শাসনের শেষ ভাগ এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের একটি সন্ধিক্ষণ। বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে হীনযান, মহাযান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীদে মহাযান থেকে মন্ত্রযান, বজ্রযান এবং সর্বশেষ সহজযানের উদ্ভব ঘটে। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন এই সহজযান বা বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের অনুসারী। নামে 'সহজিয়া' মতাদর্শ ভিত্তিক পদ হলেও বাস্তবে এসব পদের অন্তর্গত অর্থ সহজে বোঝা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করেছেন : 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানি বুঝা যায় না। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'[৪] ভাষাগত এই দুর্বোধ্যতা মূলত চর্যাপদের সাধনপদ্ধতির তত্ত্বগত ভিত্তির মধ্যে নিহিত। একথা সত্য যে, পৃথিবীর সব ভাষারই প্রাচীন সাহিত্য ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্পাপদ'ও ব্যতিক্রম নয়; চর্যার বিষয়বস্তুও ধর্মকেন্দ্রিক। চর্যার ধর্মতাত্ত্বিক এই জ্ঞান সাধারণ মানুষের নিকট বোধ্য হয় না বলেই এর ভাষাও সহজে সাধারণ মানুষের বোধ্য হয় না। যারা তান্ত্রিক ও দেহকেন্দ্রিক সাধনা করে থাকেন, তাদের পক্ষেই সম্ভবত চর্যার নিগূঢ় তাত্ত্বিক অর্থ বোঝা সম্ভব। এজন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করেছেন : 'যে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাহিরে গিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইল, তাহা কিন্তু এই চর্যাপদের বৌদ্ধ ধর্ম নহে। ইহা এক অতি গূঢ় ও গুপ্ত সাধন-পদ্ধতি।'[৫] এই গুপ্ত সাধন-পদ্ধতির মূলে ছিল কায়াসাধনা বা দেহকেন্দ্রিক সাধনা। সহজিয়া সাধকদের মতে, মানবদেহ হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ (Microcosm); তারা বিশ্বাস করেন– যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তা-ই আছে দেহভাণ্ডে বা মানবদেহে। এজন্য তাঁরা মনে করেন, সত্যের সন্ধানে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, নিজের দেহের মধ্যেই সেই পরম সত্য বা 'সহজ' সত্তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। চর্যার সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> চর্যাপদে বজ্রযান ও সহজযানের গূঢ় ধর্ম, সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা ধরনের রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা আভাস-ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত কালক্রমে নানা উপধর্মে [যেমন– বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান] বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাধনতত্ত্বে এঁদের নানা মত-পার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্বন্ধে এঁরা সকলেই একলক্ষ্য ছিলেন। বাস্তব জীবনের জরা মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পার হয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। এঁরাও সেই পথের যাত্রী। তবে সেই পথে পৌঁছাতে গিয়ে পদকর্তারা নানাপ্রকার গূঢ়

তান্ত্রিক আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন, যা অবলম্বন করলে সাধক অতি সহজে নির্বাণে পৌঁছে যেতে পারেন।[৬]

চর্যাপদের তাত্ত্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো 'সহজ' তত্ত্ব। 'সহজ' শব্দের অর্থ যা জন্মের সাথে সাথেই অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ সহজাত। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতে, মানুষের মনের গহীনে এক পরমানন্দময় সত্তা বিদ্যমান, যা অবিদ্যা বা মায়ার আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে। সাধনার মাধ্যমে মায়া-স্বরূপ এই অবিদ্যার আবরণ অপসারণ করা সম্ভব হলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাকেই বলা হয় 'সহজানন্দ' বা 'মহাসুখ'। মূলত এই মহাসুখই হচ্ছে নির্বাণ লাভ বা মুক্তির চূড়ান্ত উপায়। দেহকে কেন্দ্র করেই যে চর্যার সাধনপদ্ধতি বিস্তৃত হয়েছে, তা চর্যাপদের প্রথম পদেই লুইপা ইঙ্গিত দিয়েছেন :

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পিরমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।[৭]

এই পদে দেহতত্ত্ব ও সহজযানের সাধনাপথ একসঙ্গে উপস্থাপিত। দেহকে বৃক্ষরূপে কল্পনা– পঞ্চইন্দ্রিয় পাঁচটি শাখা। সমাধিতে সাময়িক দুঃখমুক্তি মেলে, কিন্তু সমাধি ভাঙলে পুনরায় পুরনো অবস্থায় ফেরা যায়। সেজন্য ছন্দ বা বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আশা পরিত্যাগ করে শূন্যতার পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ। শেষে লুইপাদ বলছেন, তিনি ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে সেই পরমার্থ প্রত্যক্ষ করেছেন। বৌদ্ধ অনিত্য তত্ত্ব এবং গুরু-পরম্পরা– দুটি মৌলিক ধর্মীয় বিষয় রূপকের আড়ালে প্রকাশ করা হয়েছে। শরীর হলো একটি বৃক্ষের মতো যার পাঁচটি ডাল [পঞ্চ ইন্দ্রিয়]। চঞ্চল চিত্তে কাল বা মৃত্যু প্রবেশ করে; অর্থাৎ দেহে অনিবার্যভাবে মরণশীল। এখানে সিদ্ধাচার্যরা শরীরকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করে বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলোর চঞ্চলতা দমন করতে পারলেই কেবল মহাসুখের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। মাহবুবুল হক মনে করেন, চর্যাগীতির মূল পাঠসমূহ এবং এদের আধুনিক গদ্য রূপান্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পদকর্তাগণ কেবল কবিত্ব প্রদর্শন করেননি, বরং জীবন ও জগতের এক গভীর নিহিত অর্থ এখানে প্রদান করেছেন।[৮] কীভাবে সাধনা করতে হবে, সাধনার সঠিক উপায় কী? এসব মূলত নির্ভর করছে সাধকের সাথে সদ্গুরুর পরামর্শ অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছেন কী না? যদি সাধক সঠিক গুরুর নিকট থেকে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন, তবেই তিনি 'মহাসুখ' স্বরূপ নির্বাণ লাভ করতে পারবেন। সাধকের মহাসুখ লাভের উপায় কেমন হবে, তাও চর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে, কাহ্নপাদ লিখেছেন :

তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী।
নিঅ দেহ করণা শূণ মেহেরী।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ।।[৯]

বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান ধারণা গুরুত্বপূর্ণ– বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ; এই ত্রিশরণকে নৌকা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই নৌকার আটটি কামরা হলো অষ্টবুদ্ধধর্ম– অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা। দেহের সাধনার মধ্য দিয়েই এই আটটি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। মাঝ নদীতে ঢেউ বুঝে পারলাম, পঙ্কতথাগতকে দাঁড় করা হলো কায়া-নৌকা বেয়ে। ত্রিরত্নের সাহায্যে ভবসাগর পার হওয়া এবং অষ্ট বৌদ্ধ সিদ্ধির ধারণা– পদের কেন্দ্রীয় ধর্মতত্ত্ব।[১০] বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনের আরেকটি স্তম্ভ হলো 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়'-এর মিলন। এখানে প্রজ্ঞা হলো স্ত্রীতত্ত্ব বা শূন্যতা এবং উপায় হলো পুরুষতত্ত্ব বা করুণা। এই দুইয়ের মিলনেই 'বোধিচিত্ত' উৎপন্ন হয়, যা সাধককে নির্বাণের পথে নিয়ে যায়। চর্যাপদে এই মিলনকে ডোমনী, শবরী বা চণ্ডালিনীর সাথে মিলন হিসেবে রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। বিরুপাদ লিখেছেন :

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।।
সহজে থির করি বারুণী বান্ধ।
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ।।[১১]

'শুঁণ্ডিনী' রূপকার্থে এখানে নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক। 'দুই ঘর'-এর রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে– দুই নাড়ী– ইড়া ও পিঙ্গলা। 'বারুণী' হলো বোধিচিত্ত, যা সহজেই স্থির করতে বলা হচ্ছে। দশমী দুয়ার হলো নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ দশম দ্বার। দেহের চৌষট্টি পীঠের রূপক অনুযায়ী সাধক যখন বোধিচিত্তকে মূলাধার চক্র থেকে মহাসুখচক্রে উন্নীত করতে পারেন, তখনই অজর-অমরত্ব লাভ হয়। এটি বজ্রযানের কুণ্ডলিনী-সদৃশ চক্রসাধনার স্পষ্ট কাব্যিক প্রকাশ।[১২] এখানে শুণ্ডিনী বা মদ্যবিক্রেতা বলতে বোঝানো হয়েছে সেই নারীকে, যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞার প্রতীক। যে নারীর [শুণ্ডিনি] সাথে মিলনে

সাধক বারুণী বা জ্ঞানরূপ মদিরায় মত্ত হয়ে উঠতে সক্ষত হয়। এখানে 'মত্ততা' সাধারণ নেশা নয়, বরং এটি জাগতিক মোহমুক্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'চর্যাপদ'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদক অতীন্দ্র মজুমদার নর-নারীর এই মিলন সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

> মৈথুনজাত আনন্দ বা সাধকের বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যাবে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আর সেই মন্ত্র সাধনার শক্তিকে মৈথুনজাত আনন্দ থেকে বিভিন্ন দেবদেবী জন্ম নেবেন এবং সাধকের ধ্যানচক্ষুর সামনে এক-একটি মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হবেন। সাধক যদি এই মণ্ডলগুলির সম্যক ধ্যান করতে থাকেন, তবেই তাঁর বোধিচিত্ত স্থায়ী স্থির দৃঢ় এবং কঠিন হয়ে আস্তে আস্তে বোধিজ্ঞানে বিলীন হয়ে যাবে। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় দমিত হয়ে গেছে, সমস্ত কামনাবাসনা অন্তর্হিত হয়েছে এবং সাধক তখন পরমজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন।[১৩]

সুতরাং 'চর্যাপদ'-এ যে মিলনের কথা বলা হয়েছে, তাকে সাধারণ মনে করার কোনো কারণ নেই। সোজা কথায় যদি আমরা বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে 'চর্যাপদ'-এ মিলন অর্তে সাধারণ নর-নারীর মিলন বা যৌনতাকে বোঝানো হয়নি। কথার আড়ালে এভাবেই গভীর অর্থ ব্যক্ত করার মাধ্যমে চর্যাপদকর্তাগণ তাদের সাধনতত্ত্বকে অসাধারণ এক ব্যঞ্জনায় শিল্পিত করে তুলেছেন। সেটা উপরে উদ্ধৃত অতীন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট অনুমান করা সম্ভব।

চর্যাপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর ভাষা। চর্যাপদের ভাষা সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য নয়, সম্ভবত এ কারণেই গবেষকগণ একে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো-আঁধারি ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। চর্যার ভাষা নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এর ভাষা : 'আলো-অন্ধকারের সন্ধিস্থলের মতো অস্পষ্ট; কিয়দংশ বুঝা যায়, কিয়দংশ বুঝা যায় না।'[১৪] কেন এই অস্পষ্টতা? এর প্রধান কারণ ছিল সাধকদের সাধন-পদ্ধতির নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং সাধনতত্ত্বের গোপনীয়তা রক্ষা। অ-দীক্ষিত বা সাধারণ মানুষের কাছে এই গূঢ় তত্ত্বগুলো ছিল বিভ্রান্তিকর বা দুর্বোধ্য। চর্যায় পদকর্তাগণ তাঁদের সাধনতত্ত্ব গোপন রাখার স্বার্থেই পদগুলোতে রূপক-প্রতীক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। সাধনার এসব গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে এর রূপক-প্রতীক-উপমার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে। সেটা তখনই সম্ভব, যদি সদ্গুরু এসব রূপক-প্রতীক-উপমার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর শিষ্যকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দেন। দৃশ্যত পদগুলো সাধারণ মনে হলেও এর অন্তরালে সাধনার এক গূঢ় তাত্ত্বিক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এসব উপমা-রূপক এবং প্রতীকের দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে, তা এরকম :

> নৌকা চালানো: এটি জীবনের সংসার সমুদ্র পাড়ি দেওয়া এবং নির্বাণ লাভের প্রতীক।
> বিয়ে বা মিলন: এটি আত্মা বা চিত্তের সাথে পরম সত্যের মিলনের রূপক।
> দাবা খেলা: চিত্তকে বশে আনার বা জীবনযুদ্ধের প্রতীক।

এই রূপকগুলো ব্যবহারের ফলে চর্যাপদ একই সাথে ধর্মীয় সাহিত্য এবং উচ্চমানের শিল্পে উন্নীত হয়েছে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'অবস্‌কিউর রিলিজিয়াস কাল্টস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'চর্যাপদ কেবল শুষ্ক ধর্মতত্ত্ব নয়, বরং এতে কবির আবেগ ও হৃদয়ের অনুভূতি সার্থকভাবে মূর্ত হয়েছে।'[১৫] অর্থাৎ চর্যাপদগুলো ধর্মতত্ত্বকেন্দ্রিক রচনা হলেও এখানে ব্যক্তি পদকর্তার মানসিক সংযুক্তি পদগুলোকে শিল্পসৌকর্যে উদ্ভাসিত করেছে। একইসাথে একথাও সত্য যে, এসব পদে ধর্মীয় তত্ত্বের কথা যেহেতু রূপক-প্রতীকে আড়ালে ব্যক্ত করা হয়েছে, ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এর সাথে সামাজিক-মানবিক বিষয়াবলিও যুক্ত হয়েছে।

চর্যাপদের নিগূঢ় তত্ত্ব

চর্যাপদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, 'সহজতত্ত্ব' এবং 'সন্ধ্যাভাষা'র রহস্য নিয়ে আলোচনার পরে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে– এর অন্তর্নিহিত দর্শনের আরও গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস করা। চর্যাপদে 'শূন্যতা', 'করুণা', 'বোধিচিত্ত' ও 'গুরুর ভূমিকা'– প্রভৃতি জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সহজ সমাজ-জীবনের রূপকে মূর্ত হয়েছে। চর্যাপদের তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো বৌদ্ধ 'শূন্যতাবাদ'। তবে এই শূন্যতা মানে 'কিছু না থাকা' নয়; বরং এটি এক অনির্বচনীয় অবস্থা, যা সবকিছু থেকে মানবসত্তাকে মুক্ত করে– অর্থাৎ যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদাসৎ নয়; এমনকি এর কোনোটিই নয় এমনও নয়! সিদ্ধাচার্যগণ এই শূন্যতাকে 'নিরাত্মা' বা নৈরাত্মা দেবীরূপে কল্পনা করেছেন। সাধক যখন তাঁর অহংবোধ বা 'আমি'ত্ব বিসর্জন দেন, তখনই তিনি নিরাত্মা বা নৈরাত্মা দেবীর আলিঙ্গন লাভ করেন। এর মাধ্যমে সাধক চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করেন, যা তাকে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ডোম্বি বা ডোমজাতীয় রমণী নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক। ডোমজাতীয় রমণী যেমন অস্পৃশ্যতা হেতু নগরের বাইরে থাকেন, তেমনি নৈরাত্মাদেবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে অবস্থিতা। কেবল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বল বাইরের সাধকরা তাঁকে পেতে চান, কিন্তু পান না। কাহ্নপাদ ঘৃণা-লজ্জা ত্যাগ করে; অর্থাৎ অন্তরের সমস্ত লোকাচার ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে– নৈরাত্মাদেবীকে পেতে কাপালিক

হয়েছেন। আচারসর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার ঘোষণা এ পদের মূল ধর্মীয় বক্তব্য।[১৬] চর্যাপদের দশম পদে কাহ্নুপা লৌকিক ডোমনীর রূপকে এই নৈরাত্মা দেবীর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ।।
আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ণ কাপালি জোই লাঙ্গ।।
এক সো পদমা চৌষঠঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।[১৭]

এখানে 'ডোম্বি' বা ডোমনী কোনো লৌকিক অন্ত্যজ নারী নয়, তিনি হলেন জ্ঞান-মুদ্রা বা নিরাত্মা। সে নগরের বাইরে অর্থাৎ লোকালয় বা সাধারণ চেতনার বাইরে বাস করে। সাধক কাহ্নুপা সেই অস্পৃশ্য জ্ঞানমূর্তির প্রেমে মত্ত। অস্পৃশ্য জ্ঞানমূর্তি সম্পর্কে মাহবুবুল হক মনে করেন, চর্যাগীতির এই রূপকগুলো আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক মনে হলেও এর গভীরে রয়েছে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত।[১৮] প্রসঙ্গত একথা মনে রাখতেই হয় যে, চর্যাপদগুলো সিদ্ধাচার্যগণ রচনা করেছেন মূলত তাঁদের সাধনতত্ত্বকে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এবং যেন তাঁরও পরবর্তীতে ভুলে না যান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

চর্যাপদের সাধনার মূল লক্ষ্য হলো 'চিত্ত'কে জয় করা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বে চিত্ত যখন জাগতিক বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্যের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'বোধিচিত্ত'। এই বোধিচিত্তই হলো নির্বাণ লাভের একমাত্র বাহন। মানুষের এই চিত্ত বড় চঞ্চল; অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সর্বদাই চিত্তকে বিপথে পরিচালিত করার কাজে লিপ্ত থাকে। লুইপা তাঁর প্রথম পদেই একে চিত্তকে 'চঞ্চল' বলে অভিহিত করেছেন। চিত্তকে বশ করার প্রক্রিয়ার কথা সিদ্ধাচার্যগণ বিভিন্ন পদে উপমা-রূপক-প্রতীকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো তা নৌকা চালানো, কখনো তুলা ধোনা আবার কখনো বা দাবা খেলা। যেমন কামলীপাদ লিখেছেন :

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা।।
আলি-কালি বেণি সারি মুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।।[১৯]

এখানে 'সূজ লাউ' হলো হৃদয়রূপ লাউ অর্থাৎ একতারা। সেই বীণার তারে অনাহত ধ্বনি বাজছে, যাকে বলা যায়– শূন্যতাতত্ত্বের ধ্বনি। 'গঅবর সমরস সান্ধি' অর্থাৎ তাদের বীণাযন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশটি বৃহৎ অংশকে জোড়া দিয়ে রাখে। আলি-কালিকে দুই সারি মনে করা হলো চিত্ত মিলিত হলো। নাচেন (চিত্ত) বজ্রধর, দেবী গান করেন, বুদ্ধনাটক এইরকম নিয়মিত হয়– সমতা লাভ বা বিশেষরূপে সমতালাভ। বীণার সুরে তান্ত্রিক ধ্যানের অভিজ্ঞতা বর্ণিত– এটি বজ্রযানের সমরসতত্ত্বের কাব্যরূপ।[২০] এছাড়া অদ্বয় বা দ্বৈতবাদমুক্ত যে অবস্থা (অবধূতী), তাকে বীণার দণ্ড বানিয়ে শূন্যতার সুরে চিত্তকে স্থিত করার কথা বলা হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে, 'চর্যাপদের কবিরা চিত্তের এই রূপান্তরকে একটি শৈল্পিক রূপদান করেছেন, যা সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যে বিরল।'[২১] সমালোচকের এ মন্তব্যের সাথে বিরোধিতার কোনো সুযোগই নেই। অবশ্যই চর্যাকারগণ তাঁদের রচিত পদকে একইসাথে শিল্প-সুষমামণ্ডিত ও ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বাহন করেছেন। চর্যার রচয়িতা পদকর্তাগণ তাঁদের রচিত পদের শিল্প-সার্থকতার ব্যাপারে যেমন যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন, তেমনি তাঁদের নিগূঢ় সাধনপদ্ধতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও কোনো আপোস করেননি।

সহজযান বা বজ্রযানের সাধনা অত্যন্ত গুহ্য, নিগূঢ় এবং দুর্বোধ্য। গুরুর নির্দেশ ছাড়া এই পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলে মনে করা হতো। সম্ভবত এ কারণেই চর্যাপদে গুরুকে 'সদ্গুরু' বা 'নাথ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে যেমন আলো পথ দেখায় তেমনি সংসার-সমুদ্রের গোলকধাঁধায় গুরুই হলেন একমাত্র কাণ্ডারী বা পরিত্রাণকর্তা। চর্যাপদের অনেক পদেই গুরুর প্রয়োজনীতার কতা তুলে ধরার পাশাপাশি গুরুত্বারোপও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লুইপা-র একটি পদ থেকে উদাহরণ নিলে বিষয়টি আমাদের নিকট আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কোপতিআই।।
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা।

তিঅ-ধাএ বিলসই উহ ন জানা।।[২২]

ভাব না হয়, অভাব না যায়– এই অবস্থায় বোধ হয় সেই সত্যকে বোঝা যায়। লুইপাদ বলছেন, বাপু (মূর্খ-শিষ্যকে সম্বোধন), বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য; তিন ধাতুতে বিলাস করে তাকে জানা যায় না। এটি নির্বিকল্প সমাধিতত্ত্বের অভিজ্ঞতা; ভাব ও অভাব উভয়ের অতীত। জলে প্রতিফলিত চাঁদ যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, যোগীর হৃদয়ে জগৎ-সংক্রান্ত ধারণাও তেমনি। মহাযানের মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যবাদের এই প্রকাশ অতুলনীয় ও কাব্যিক।[২৩] লুইপা বলেছেন বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান কিংবা মহাসুখ অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য ব্যাপার। কিন্তু গুরুর 'উপদেশ' থাকলে মহাসুখ কী কিংবা ত্রিভুবনের রহস্য বোঝা অসম্ভব নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর লিখেছেন : 'চর্যাপদের গানগুলো আসলে গুরুর নিকট দীক্ষিত শিষ্যের জন্য রচিত সংকেত লিপি।'[২৪] অর্থাৎ চাইলেও শিষ্য পদের গভীর বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় অর্থ বুঝতে পারবে না; এক্ষেত্রে শিষ্যকে অবশ্যই সদ্গুরুর নির্দেশনা বা উপদেশ মেনে চলতে হবে। সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য শিষ্য চাইলেই বুঝতে পারবে না, কিংবা সাধনায় লিপ্ত হতে পারবে না। এজন্য একজন সঠিক গুরুর প্রয়োজন হবে, যাঁর নিকট থেকে এসব তত্ত্বের মূল কথা জেনে নিয়ে সাধনায় লিপ্ত হতে হবে।

চর্যাপদের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এর লৌকিকতা। সিদ্ধাচার্যগণ পাহাড়ের চূড়ায় বাস করা শবর-শবরী, নৌকা বাইচ, চোলাই করা মদ, বা এমনকি বিয়ের উৎসবাদিও নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। এসব রূপক-প্রতীক প্রকৃতপক্ষে ছিল চর্যাপদকে সাধারণ মানুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা এবং পরবর্তীতে তাদেরকে সাধনায় দীক্ষিত করা। বলা যায়, এটা হচ্ছে– পদকর্তাদের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানোর কৌশল মাত্র। এখানে একদিকে চর্যার তত্ত্বকে যেমন সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার বিষয় ছিল, তেমনি পদগুলোর মাধ্যমে ভাষাকে সংরক্ষণেরও একটি প্রয়াস হয়তো চর্যার পদকর্তাদের মনের অজান্তেই ক্রিয়াশীল ছিল। শবরপাদের একটি পদে আমরা দেখি :

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিনী নামে সহজ সন্দরী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালি।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।।[২৫]

দেহরূপ পর্বতের উচ্চ শিখরে মহাসুখচক্রে বাস করেন শবরীরূপিণী নৈরাত্মাদেবী। বিবিধ ভাবিকল্পের অলংকারে তিনি ভূষিতা। উন্মত্ত শবর সাধককে বলছেন, তোমার নিজের গৃহিণী নাম সহজ সুন্দরী। নানা ফুলে তরুবর মুকুলিত; অর্থাৎ নানা অবিদ্যায় দেহ-সংসিক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শাখা-প্রশাখার জালে নির্বাণের আকাশ অবরুদ্ধ। গুরুর বাক্যকে ধনুক করো, নিজের মনকে বিদ্ধ করো, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ করতে হবে– এই উপদেশ লক্ষ্যভেদী ধনুর্বিদ্যার রূপকে বৌদ্ধ মোক্ষসাধনার অসামান্য প্রকাশ।[২৬] বিষয়টি সহজভাবে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, এখানে উঁচু পাহাড় হলো 'মেরু' বা দেহের উচ্চতর কেন্দ্র, আর শবরী হলো প্রজ্ঞা বা শূন্যতা। 'মোরঙ্গ পীচ্ছ' এই দৃশ্যকল্প অসাধারণ কবিত্বময়, শৈল্পিক সুষমায় উদ্ভাসিত। ময়ূরের পুচ্ছ পরা শবরী আর তার গলায় গুঞ্জার মালা– এটি একাধারে চমৎকার কবিতা এবং গভীর যোগতত্ত্বের বর্ম দ্বারা আবৃত; এখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। চর্যাপদের এই রূপকধর্মিতা সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : 'চর্যাপদের কবিরা পার্থিব জীবনের তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে অপার্থিব জগতের মানচিত্র এঁকেছেন।'[২৭] এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, চর্যাপদগুলোতে খুবই সাধারণ এমনকি দৈনন্দিন জীবনের বিষয়াদি রূপক-প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন পদকর্তাগণ। অর্থাৎ চর্যার কোনো কোনো পদে সাধতত্ত্বের গূঢ় রহস্য কিংবা তত্ত্ব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের কার্যকলাপের রূপকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য কোনো কোনো পদ আপাতদৃষ্টে সাধারণ মনে হলেও তা মূলত গভীর তাত্ত্বিক বিষয়কে পদকর্তাগণ রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

চর্যাপদের সাধনতাত্ত্বিক ভিত্তির একটি প্রধান স্তম্ভ হলো কায়া সাধনা। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের মতে, এই নশ্বর দেহই হলো যাবতীয় সত্যের আধার। মহাযান বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের তিনটি কায়া বা শরীরের কথা বলা হয়েছে– ধর্মকায়, সম্ভোগকায় এবং নির্মাণকায়। কিন্তু সহজিয়াগণ এর সাথে যুক্ত করেছেন 'সহজকায়'। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যমান, তার সবকিছুই মানবদেহের মধ্যে বর্তমান। এ প্রসঙ্গে বাউল মতাদর্শীরা প্রচার করে থাকে 'যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহ ভাণ্ডে।' চর্যার অনেক পদেই দেহকে কখনো, বৃক্ষের সাথে কখনো-বা নৌকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, চাটিল্লপাদ লিখেছেন :

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।

দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কাম গাঢ়ই।
গারগামি-লোঅ নিভর তরই।।[২৮]

উদ্ধৃত পদের চারটি ছত্রে ভবনদী বলতে সংসার-নদীর কথা বোঝানো হয়েছে রূপকের দ্বারা। সংসার স্বরূপ গভীর প্রবাহিত নদী– দুই ধারে কাদা, মাঝখানে অথৈ পানি। ধর্মসাধনার জন্য চাটিলপাদ সাঁকো তৈরি করেছেন। মোহতরু ফেলে, পাটিও জোড়া দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানরূপ টাঙ্গী দিয়ে নির্বাণকে দৃঢ় করা হয়েছে। বোধির নিকটেই থাকতে বলা হচ্ছে, দূরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি বৌদ্ধ সংসারচক্র তত্ত্ব ও নির্বাণপ্রাপ্তির পথ– জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম স্রোত থেকে মুক্তিই লক্ষ্য।[২৯] প্রসঙ্গত স্মরণীয় চর্যার পদকর্তাগণ যে শুধু দেহকে সাধনার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন, তা নয়; বরং ভারতবর্ষে যোগী, তান্ত্রিক, বাউল– এঁরা সবাই দেহকে সাধনা মূল বিষয় হিসেবে গণ্য করেন।

চর্যাপদের সাধন-তত্ত্ব বুঝতে হলে এর নাড়ী-বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকাও আবশ্যক। সিদ্ধাচার্যদের মতে, মানবদেহে প্রধান তিনটি নাড়ী রয়েছে– বামে 'ললনা', ডানে 'রসনা' এবং মাঝখানে হচ্ছে 'অবধূতী'। ললনা হলো প্রজ্ঞার প্রতীক এবং রসনা হলো উপায়ের প্রতীক। এই দুই নাড়ীর মিলন ঘটিয়ে প্রাণবায়ুকে মধ্য-নাড়ী বা অবধূতী দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। সরহপাদ তাঁর এই গুহ্য তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন :

পার উআরেঁ সোই গজিই।
দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই।।
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা।।[৩০]

না নাদ, না বিন্দু, না রবি, না শশীমঙ্গল– চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত। ঋজুপথ ছেড়ে বাঁকা পথ নিও না, বোধি কাছেই আছে (দেহের মধ্যে), দূরে যেও না। হাতের কষণ দেখবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন নেই– আপনা-আপনিই তুমি নিজের মন বোঝ। বাম-ডান মোহ-দ্বন্দ্ব– যে মোহে পতিত সে অধোগতি পায়। সহজযানের মূলতত্ত্ব– চিত্ত স্বভাবতই মুক্ত, বাইরে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক, এই পদের সারকথা।[৩১] তাত্ত্বিক একথাগুলো আমরা সাধারণভাবে বোঝার চেষ্টা করে দেখতে পারি– এ পদে 'বাম' (ললনা) এবং 'ডান' (রসনা) পথ ত্যাগ করে সোজাপথে (অবধূতী) চলতে হবে। এটাই হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতাদর্শীদের সাধনতত্ত্বের সহজপথ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : 'অবধূতী নাড়ী যখন বোধিচিত্তকে বহন করে মস্তকস্থিত মহাসুখচক্রে নিয়ে যায়, তখনই সাধক চরম সিদ্ধি লাভ করেন।'[৩২] সাধনার এই পদ্ধতি খুব সহজ কাজ না। যারা সদ্গুরুর পরামর্শ অনুসারে চলতে পারে, তাদের পক্ষেই প্রায় এ ধরনের অসম্ভব ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এজন্য আরো প্রয়োজন হয়, মানসিক স্থিতি।

বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনে নির্বাণ লাভ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি কতগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এই স্তরগুলোকে বলা হয় 'চতুরানন্দ'। প্রতিটি স্তর বা ধাপ এক এক করে অতিক্রম করতে হয়, একজন সাধককে। এসব স্তর অতিক্রম করা মধ্য দিয়ে সাধক নির্বাণ লাভ করেন এবং মহাসুখে উপনীত হন। এই চতুরানন্দ বা চার ধরনের আনন্দ হলো– আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ এবং সহজানন্দ। এই যে আনন্দের কথা বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

আনন্দ: লৌকিক বিষয়ের স্পর্শে যে আনন্দ লাভ হয়।
পরমানন্দ: যোগক্রিয়ার মাধ্যমে যখন চিত্ত বিষমুক্ত হতে শুরু করে।
বিরমানন্দ: যখন সাধক দ্বৈতজ্ঞান (সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ) থেকে বিরত হন।
সহজানন্দ: এটিই চরম অবস্থা বা 'মহাসুখ'।

চর্যাপদে এই অবস্থাকে 'অদ্বয়' বা 'সামরস' বলা হয়েছে। যখন সাধক ও সাধ্যের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। ভুসুকুপাদ তাঁর একটি পদে এই মহাসুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

বাজ ণাব পাড়ী পঁইআ খালে বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিনী চণ্ডালেঁ লেলী।।[৩৩]

প্রজ্ঞার পদ্মখালে বজ্রনৌকা বেয়ে গিয়ে চিত্ত শূন্যতায় মিলে যাওয়ার মাধ্যমে মহানন্দে প্রবেশ করল। অদ্বয়জ্ঞান-রূপ জলদস্যু সমস্ত ক্লেশ লুট করে নিয়ে গেল। এরকম অবস্থায় আজ ভুসুকু সত্যিকারের ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, নিজের অপরিশুদ্ধ নিজ প্রকৃতিকে প্রভাস্বর-প্রকৃতিতে পরিণত করে নিয়েছেন। রূপ-বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এবং ইন্দ্রিয়ের কামনাবাসনা সব দগ্ধ

করেছেন। সর্বশূন্যতায় লীন হয়ে চার রকম বিচার-বুদ্ধি অবলুপ্ত– অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে জীবনে-মরণে কোনো ভেদাভেদ থাকে না।[৩৪] এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, ভুসুকপার এ পদটি ঘিরে একটি সাধারণ ব্যাখ্যা এরকম প্রচলিত আছে– 'ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী' অর্থ বাঙালি হওয়া; প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়। এখানে মূলত সাধকের আত্ম পরিচয় বিলীন করে অদ্বয়তত্ত্বে মিশে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। সুকুমার সেন মনে করেন : 'ভুসুকুর এই বঙ্গালী হওয়া আসলে সংকীর্ণ ব্যক্তি-সত্তা বিসর্জন দিয়ে বিশ্ব-সত্তায় লীন হওয়ারই এক কাব্যিক প্রকাশ।'[৩৫] এখানে বাঙালি অর্থে বিশেষ কোনো জাতি-গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়নি; বরং নিগূঢ় সাধনার মাধ্যমে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে সার্বিক সত্তায় লীন হওয়া বা নির্বাণ লাভের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

চর্যাপদের কবিরা তাঁদের তাত্ত্বিক কথাগুলো বলতে গিয়ে সমকালীন ব্রাত্য সমাজের বিভিন্ন পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। কথাবাহুল্য, চর্যাপদাকর্তাগণও ছিলেন সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। ফলে তাদের রূপক-প্রতীকে স্ব-শ্রেণী ও পেশার মানষদের কথাই তারা ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

তাঁতি বা তুলা ধোনা : চিত্তকে নির্মল করার প্রতীক (শান্তিপাদ)।
মদ তৈরি: আধ্যাত্মিক নেশা বা বারুণীর প্রতীক (বিরুবাাপাদ)।
নৌকা চালানো: ভবনদী পার হওয়ার কৌশল।

উপরে বিবৃত এই পেশাজীবী মানুষগুলোর প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর পরিশ্রমের আড়ালে যে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা লুকিয়ে ছিল, তা চর্যাপদকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি সমাজতাত্ত্বিক দলিল হিসেবেও প্রতীয়মান করে। মাহবুবুল হক চর্যাকারদের এই প্রান্তিক পেশাশ্রেণির মানুষের উপস্থাপন প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'চর্যাপদ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, সেকালের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল যেমন কন্টকাকীর্ণ, তেমনি তাঁদের সাধন-জীবন ছিল গভীর ও রহস্যময়।'[৩৬] চর্যার একেবারে সাধারণ পাঠ গ্রহণ করলে আমরা স্পষ্টতই সেখানে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করি। পূর্বেই বলেছি, চর্যাপদকর্তাগণও ছিলেন সমাজের নিচু স্তরের মানুষ। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্ব-শ্রেণির কথা সাধন-পদ্ধতির রূপক-প্রতীকে আরোপ করেছেন।

চর্যাপদ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দলিল নয়, এটি তৎকালীন ব্রাত্য বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র। সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের অবহেলিত শ্রেণি– যেমন, ডোম্বি, চণ্ডাল, শবরদের জীবন থেকে উপমা-রূপক এবং প্রতীক গ্রহণ করেছেন। তবে এই সামাজিক চিত্রগুলোর আড়ালে সর্বদা একটি সাধনমার্গের তাত্ত্বিক সংকেত ক্রিয়াশীল ছিল। ঢেণ্‌ঢণপার পদে বলা হচ্ছে :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেগ সংসার ডব্‌হিল জাঅ।
দুহল দুধু কি বেন্টে ষামায়।।
বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।।[৩৭]

'টালত' অর্থাৎ টিলাতে দেহরূপ স্তূপের শিখরে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য প্রেমিক (অতিথি) ভিড় করে। বেগে বেড়ে যাচ্ছে সংসার– ব্যাঙের সংসার ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। যে বুদ্ধিমান, সেই ধন্য বুদ্ধি; যে সেই চোর, সেই আবার দারোগা (সেই সাধু)। নিয়ত শিয়াল-সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। গৃহস্থালির রূপকে জাগতিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্ব এবং সহজসাধকের একাকিত্বের যন্ত্রণা বর্ণিত– মায়া-প্রপঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সহজজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ।[৩৮] তবে কেউ কেউ সাধারণভাবে এ পদটির সাধারণ অর্থ তৈরি করেন এভাবে : 'টিলার ওপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু অতিথির ভিড় লেগে থাকে।' এ ধরনের বক্তব্যে আপাতদৃষ্টে চরম দারিদ্র্যের ছবি প্রতিফলিত হলেও এর তাত্ত্বিক অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। এখানে বোঝানো হচ্ছে– সাধক যখন নির্বাণের উচ্চ স্তরে বা শিখরে (টিলায়) আরোহণ করেন, তখন তিনি পার্থিব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। 'ভাত না থাকা' অর্থে বোঝানো হয়েছে জাগতিক তৃষ্ণা নিবারণ এবং 'অতিথি'র অর্থ এখানে হচ্ছে– আধ্যাত্মিক বোধের উদয় হওয়া। মাহবুবুল হক তাঁর গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'চর্যাপদের সমাজজীবন মূলত সাধন-জীবনের রূপক হিসেবেই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।'[৩৯] চর্যায় সাধারণভাবে যা দেখা যায়, প্রকৃত অর্থে তা বলা হয় না; এখানে চর্যাপদকর্তাগণ সর্বদাই রূপক-প্রতীকের আড়াল গ্রহণ করেছেন। এ পদটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনে নারীর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাপদে 'ডোম্বি', 'শবরী', 'চণ্ডালী' বা 'যোগিনী'– সবই হলো প্রজ্ঞা বা শূন্যতার প্রতীক। সাধকের পুরুষ সত্তা (উপায়) যখন এই নারী সত্তার (প্রজ্ঞা) সাথে মিলিত হয়, তখনই অদ্বয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কুক্কুরীপা তাঁর পদে লিখেছেন:

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী।।
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।[৪০]

উপরে উদ্ধৃত পদটি চর্যার সন্ধ্যাভাষা হওয়া কিংবা বুঝতে পারা না-পারার যে সংশয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। খুব সাধারণ চোখে বিবেচনা করলে মনে হবে– বাইরে গৃহস্থালির দৃশ্য, কিন্তু গভীরতর অর্থে হচ্ছে এরকম : দেহরূপ ঘরের মধ্যেই মহাসুখের আধার লুকিয়ে আছে; সহজানন্দরূপ চোর প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিষেকের সময়– এসে চলে যায়। যারা অনভিজ্ঞ তারা চিত্তকে নির্বাণমার্গে চালিত করতে পারে না। একমাত্র গুরুর উপদেশে সমাধির সাহায্যে চিত্তকে নিঃসভাবে পরিচালিত করা সম্ভব। সহজযানের চিত্তশুদ্ধির তত্ত্ব এই পদের মূল ধর্মীয় বার্তা।[৪১] যারা সাধক, একমাত্র তারাই পাবেন পদের মূল বার্তা। আপাত অর্থে এখানে পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতার মধ্য দিয়ে সাধক তাঁর পরমাত্মীয় বা নির্বাণসত্তাকে খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে : 'সহজযানে নারী কেবল লৌকিক সঙ্গিনী নন, তিনি সাধকের মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি।'[৪২] শুধু চর্যাপদে নয়, বিভিন্ন সাধনতাত্ত্বিক মতাদর্শে নারীকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়েছে। বিশেষত বাউল, বৈষ্ণব, যোগতন্ত্র কিংবা বৌদ্ধদের সহজিয়া মতাদর্শেও নারীকে সাধপথের বাহন হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এরকম মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয় যে, নারী ছাড়া কোনোভাবে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করাও অসম্ভব।

চর্যাপদের এই সহজিয়া দর্শন পরবর্তীকালে 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং বিশেষ করে বাউল দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। চর্যাপদের 'সহজ' মানুষই বাউলদের 'মনের মানুষ' বা 'সহজ মানুষ' হিসেবে প্রতীকায়িত হয়েছে। লালন শাহ্ যখন গেয়ে ওঠেন, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়', তখন সেই 'পাখি' আসলে চর্যাপদের সেই 'চঞ্চল চিত্ত' বা 'বোধিচিত্তেরই' বিবর্তিত রূপ। মাহবুবুল হক তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পাঠ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, চর্যাপদের দার্শনিক ধারাটি বাংলার লোকায়ত জীবন ও সাহিত্যে একটি প্রবহমান নদীর মতো মিশে আছে।[৪৩] এই যে দেহকেন্দ্রিক সাধনা এবং গুরুমুখী শিক্ষা, তা হাজার বছর ধরে বাঙালি মননকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

উপসংহার

চর্যাপদের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কিত এ দীর্ঘ আলোচনার শেষে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চর্যাপদ কেবল বাংলা সাহিত্যের আদি উৎস নয়, বরং এটি বাঙালির হাজার বছরের জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ভিত্তি বা সূচনা। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত অমূল্য এই সম্পদ হাতে আসার পর আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রাচীন বাংলার মানুষ কেবল পরকাল বিমুখ সাধক ছিলেন না, বরং তাঁরা এক উন্নত শিল্পমণ্ডিত সাধন-পদ্ধতির অধিকারীও ছিলেন। চর্যাপদের তাত্ত্বিক কাঠামো মহাযান বৌদ্ধধর্মের জটিল জটাজাল থেকে মুক্ত হয়ে 'সহজ' ও 'মহাসুখের' তথা সহজযান মতাদর্শীদের যে মন্ত্র প্রচার করেছে, তা মূলত মানবতাবাদেরই জয়গান। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যগণ শিখিয়েছেন যে, মানুষের আপন দেহই শ্রেষ্ঠ মন্দির এবং চিত্তশুদ্ধিই হলো শ্রেষ্ঠ পূজা।[৪৪] 'চর্যাপদ' গ্রন্থটি আমাদের এই নিগূঢ় সত্যগুলো অনুধাবনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চর্যাপদ আমাদের শেখায়– সত্য কোনো দূরবর্তী বস্তু নয়, তা আমাদের 'সহজাত' এবং ঘরের কাছেই বিদ্যমান। যেমনটি পদকর্তারা বলেছিলেন, 'হাতর কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ'– অর্থাৎ হাতের কাঁকন দেখার জন্য আয়নার প্রয়োজন হয় না। তেমনি সত্যকে দেখার জন্য বাইরের আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল অন্তর্দৃষ্টি। বর্তমানের বস্তুবাদী ও জটিল সময়ে চর্যাপদের এই 'সহজ' দর্শন আমাদের মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক মুক্তির নতুন পথ দেখাতে পারে। চর্যাপদ তাই কেবল অতীত নয়, এটি বাঙালির চিরন্তন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

পরিশেষে বলা যায়, চর্যাপদ কেবল বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন নয়, বরং এটি প্রাচ্য দর্শনের এক বিস্ময়কর ফসল। এর তাত্ত্বিক ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ ধর্মের হাজার বছরের বিবর্তিত রূপ এবং লোকজ সহজবোধের সমন্বয়ে। চর্যাপদের পদকর্তাগণ এক হাজার বছর আগে যে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, তা আজও সমাজতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। চর্যাপদের শিক্ষা হলো– নিজের ভেতরকে চেনা এবং ইন্দ্রিয়জ মোহের অতীত হয়ে মহাসুখের সন্ধান করা। এই নিবন্ধে আমরা চর্যাপদের তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি প্রাথমিক রূপরেখা প্রদানের চেষ্টা করেছি মাত্র; এর গভীরতা আরও বিশাল এবং রহস্যময়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, ৩য় সং, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৩; পৃ.ভূমিকা

[২] সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *নতুন চর্যাপদ*, ২য় সং, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৯

[৩] অনুপম হাসান, *চর্যাপদ (বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙস)*, ১ম প্র, ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, ২০২০; পৃ.১৪৪

[৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, পূর্বোক্ত; পৃ.৮ [মুখবন্ধ]

[৫] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.৯ [মুখবন্ধ]

[৬] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, নতুন সং, কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি., ২০১৪; পৃ.১৫

[৭] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [১নং চর্যা: লুইপাদ], ২য় সং, ৩য় মু. কলকাতা: নয়াপ্রকাশ, ১৩৬৭; পৃ.১১৯

[৮] মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, ২য় সং, পুনর্মু, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি, ২০১৬; পৃ.২৪৪

[৯] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [১৩নং চর্যা: কাহ্নুপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৩৫

[১০] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৫-১৩৬

[১১] তদেব, [৩নং চর্যা: বিরুআ], পৃ.১২১

[১২] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১২১-১২২

[১৩] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.৭৪

[১৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*, পূর্বোক্ত; পৃ.৮ [মুখবন্ধ]

[১৫] Shashivusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Edi. 3rd, Kolkata: Farma KLM Private Limited, 1969; P.35-40

[১৬] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩১

[১৭] তদেব, [১০নং চর্যা: কাহ্নুপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ,১৩০

[১৮] মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০

[১৯] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [১৭নং চর্যা: বীণাপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৪০

[২০] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৪১

[২১] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), পুনর্মু, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১; পৃ.৮২

[২২] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [২৯নং চর্যা: লুইপাদানাম], পূর্বোক্ত; পৃ.১৫৬

[২৩] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৫৭

[২৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, পূর্বোক্ত; পৃ.১৫ [ভূমিকা]

[২৫] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [২৮নং চর্যা: শবরপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৫৪

[২৬] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৫৪-১৫৫

[২৭] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙ্স*, রিভাইজড সং, কলকাতা: বেরুবাড়ী পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬; পৃ.২৮

[২৮] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [৫নং চর্যা: চাটিল্লপাদ] পূর্বোক্ত; পৃ.১২৪

[২৯] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১২৪

[৩০] তদেব, [৩২নং চর্যা: সরহপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৬০

[৩১] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৬০-১৬১

[৩২] Shashivusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Ibid; P.92-95

[৩৩] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [৪৯নং চর্যা: ভুসুকুপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৮২

[৩৪] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৮২

[৩৫] সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, ১ম সং, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫; পৃ.১১০

[৩৬] মাহবুবুল হক, **চর্যাগীতি পাঠ**, পৃ.১১৮ (সমাজচিত্র ও টীকা)

[৩৭] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [৩৩নং চর্যা: ঢেণ্‌ঢণ পাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১৬১

[৩৮] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১৬২

[৩৯] ড. মাহবুবুল হক, চর্যাগীতি পাঠ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯২ (টীকা ও আলোচনা)

[৪০] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* [২নং চর্যা: কুক্কুরীপাদ], পূর্বোক্ত; পৃ.১২০

[৪১] তদেব, পূর্বোক্ত; পৃ.১২০

[৪২] Shashivusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Ibid; P.101-105

[৪৩] মাহবুবুল হক, *চর্যাগীতি পাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩২

[৪৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫-২৭

গ্রন্থপঞ্জি

[১] মজুমদার, অতীন্দ্র (১৩৬৭): চর্যাপদ, কলকাতা: নয়াপ্রকাশ

[২] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৪): বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.

[৩] শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ (১৯৬৬): বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙ্স, কলকাতা: বেরুবাড়ী পাবলিশিং হাউস

[৪] শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৪১৩): হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

[৫] শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ (২০১৯): নতুন চর্যাপদ, ঢাকা: কথাপ্রকাশ

[৬] সেন, সুকুমার (১৯৯১): বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স

[৭] হক, মাহবুবুল (২০১৬): চর্যাগীতি পাঠ, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি

[৮] হাসান, অনুপম (২০২০): চর্যাপদ (বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙস), ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার

[৯] Dasgupta Shashivusan (1969): Obscure Religious Cults, Kolkata: Farma KLM Private Limited